দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার মূলনীতি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

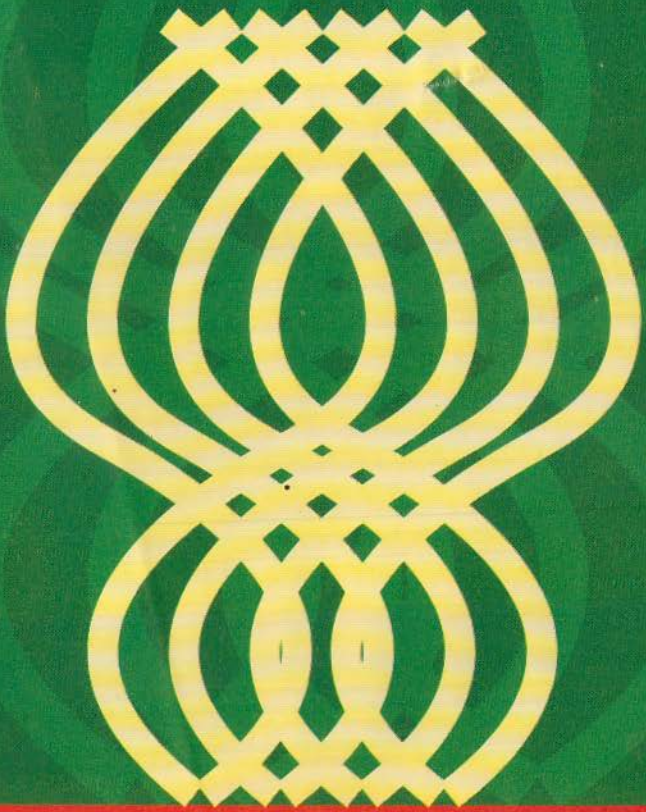

দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার মূলনীতি

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন। এ জিহাদে সফলতা অর্জনের জন্য যৌথবাহিনী, র‍্যাব, গোয়েন্দা বিভাগ, টাস্কফোর্স, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অনেকগুলো সংস্থা রাত-দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। প্রশ্ন উঠেছে, বিগত ছয় মাসে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদের সফলতা কতটুকু? জবাবে কেউ বলতে পারেন ৩৬ বছরের জমে ওঠা জঞ্জাল মাত্র ছয়মাসে পরিচ্ছন্ন করা কিভাবে সম্ভব? ছয় বছরেও সম্ভব নয়। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রের এমন কোনো ছিদ্র নেই যে পথে এই দুর্নীতি নামক **'ইঁদুর'** প্রবেশ করেনি। নার্সারী, কেজি, প্রাইমারী, মক্তব, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও, হাসপাতাল, ধর্মীয় উপাসনালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিল্প-কলকারখানা, কোর্ট, কাছারী তথা মুরগীর ফার্ম থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানজনক ভবন পর্যন্ত দুর্নীতির রাজত্ব বিস্তৃত। দুর্নীতি নামক দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত আজ গোটা দেশ। শুধু হুমকী-ধমকী, মামলা-মোকদ্দমা বা জেল-জরিমানায় এ মারাত্মক ব্যধি থেকে সমাজদেহ সাময়িক নিরাময় লাভ করেছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজ দেহের রক্ত কণিকা ক্যান্সার মুক্ত নয়। সুযোগ পেলেই এ ব্যধি গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে মরণ দুয়ারের কাছাকাছি পৌছে দিবে। কারণ দুর্নীতি নামক ক্যান্সারে সমাজ নামকদেহ এতটা আক্রান্ত যে, ক্যামোথেরাপী গ্রহণের শক্তিও তার বিলুপ্তির পথে।

তবে অপরাধ আর দুর্নীতির এ করাল গ্রাসে শুধু যে বাংলাদেশ আক্রান্ত তা কিন্তু নয়। আমরা যেসব দেশগুলোকে সভ্য দেশ বলে আখ্যায়িত করি তারাও কিন্তু

www.pathagar.com

আমাদের থেকে কম যায় না। দরিদ্র দেশ বলে আমাদের ছিন্ন বসনের কারণে শরীরের দোষ-ত্রুটিসমূহ দৃশ্যমান হয়ে পড়ে বেশী– এই যা। নতুবা আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, এশিয়ার কয়টি দেশ এমনটি পাওয়া যাবে– যা দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতা থেকে শতভাগ মুক্ত? শুধু একটি দৃষ্টান্ত দেখুন, গত কয়েক বছর পূর্বে নিউইয়র্ক শহরে রাতে কয়েক ঘন্টার জন্য বিদ্যুৎ ছিল না। দুনিয়া জানে, মাত্র কয়েক ঘন্টার অন্ধকারের সুযোগে পৃথিবীর এই বৃহত্তম শহরে চুরি-ডাকাতী, হত্যা-ধর্ষনসহ অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছিলো। এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যা রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে। দুর্ভাগ্য এখানে যে, আমাদের দোষসমূহের যেমন ঢাক-ঢোল পেটানো হয়– গুণ-বৈশিষ্টসমূহের তেমন প্রচার আদৌ হয় না। যেমন একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করতে চাই, জাতিসংঘ একবার বিশ্বব্যাপী একটি জরিপ চালিয়েছিলো। সবথেকে কম দুর্নীতি পরায়ণ দেশ কোন্‌টি? সে জরীপে জানা গেলো, সারা বিশ্বের মধ্যে সাউদী আরবেই দুর্নীতি ও অপরাধ সবথেকে কম। আমেরিকার ৫২টি রাজ্যের শুধু নিউইয়র্ক শহরে ২৪ ঘন্টায় যে চুরি-ডাকাতী, হত্যা-ধর্ষনসহ নানা প্রকারের অপরাধ ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়, সাউদী আরবে সারা বছরেও তা হয় না। কারণ সেখানে রাজতন্ত্র থাকলেও দেশ পরিচালনার বহুল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কার্যকর রয়েছে।

কাজেই অপরাধ ও দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠন এটি খুব সহজ বিষয় নয়। এর জন্য প্রয়োজন একটি উত্তম মডেল। এ রকম অনুসরণীয় একটি মডেল উত্থাপন করাই আমার আজকের আয়োজন। পাঠকদের আমি ইতিহাসের ১৪শত বছর পূর্বের একটি চিত্র দেখাতে চাই। যে সময়টাকে আমরা অন্ধকার যুগ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগ বলে আখ্যায়িত করে থাকি। যেখানে মানুষ চুরি-ডাকাতী, জেনা-ব্যভিচার, হত্যা-ধর্ষন, মিথ্যা-প্রতারণা, হিংসা-বিদ্বেষ কোনোটিকেই পাপ বা অপকর্ম মনে করতো না। সমস্ত অবৈধ কাজগুলোই ছিলো তাদের কাছে বৈধ। এ রকম একটি পরিবেশে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই সমাজে প্রেরণ করলেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান নেতা মহানবী বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে।

তিনি আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান ও নিজস্ব উত্তম চরিত্র মাধুর্য দিয়ে গোটা সমাজের চিত্র বদলে দিলেন। মাত্র একটি যুগের সাধনায় সহস্র বছরের মসীলিপ্ত ইতিহাস পরিণত হলো স্বর্ণালী ইতিহাসে। সমাজে যারা ছিলো চোর-ডাকাত, দুর্নীতিবাজ– তাঁরা হলেন মানুষের সম্পদের পাহারাদার। যারা ছিলো নারীর সতীত্ব হরণকারী ও

www.pathagar.com

হন্তারক, তারা হয়ে গেলেন মানুষের জীবন ও নারীর সতীত্বের সংরক্ষণকারী। মরু বেদুঈন রাখালরা হয়ে গেলেন ন্যায় বিচারক, খলীফা, বিচারপতি, সেনাপতি আরো কত কি। তদানীন্তন সমাজের অধিবাসীদের এ ছিলো চারিত্রিক জীবনে এক মহাবিপ্লব। যে বিপ্লবের মহানায়ক ছিলেন আল্লাহর প্রিয় রাসূল মানবকুল শ্রেষ্ঠ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। তাঁর হাতে ছিলো না কোনো যাদুর কাঠি। ছিলো আল্লাহর বাণী আল কোরআন– যার পবিত্র ছোঁয়ায় মৃতপ্রায় জাতি লাভ করলো পুনর্জীবন, চীর অবহেলিত নারীরা পেলেন বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকার, শ্রমিক, শিশু, সাদা-কালো, ধর্ম-বর্ণ সকল শ্রেণীর মানুষরা পেলো খাদ্য-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা ও আবাসনসহ রাতের আঁধারে দরজা খুলে নিরপাদে ঘুমাবার নিশ্চয়তা।

নবী করীম (সাঃ) তদানীন্তন সমাজের লোকদের এ কথা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এই দুনিয়ার জীবনটাই শেষ কথা নয়, আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত জীবনের মেয়াদ শেষ হলে আমাদের মৃত্যু হবে এবং মৃত্যুর পর নির্ধারিত সময় কিয়ামত (বিচার দিবস) অনুষ্ঠিত হবে আর তখন আল্লাহর সম্মুখে আমাদের জীবনের সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য তথা কাজ ও লেন-দেনের বিষয়গুলোর পক্ষপাতহীন চুল-চেরা হিসাব হবে এবং এরই ভিত্তিতে ফয়সালা হবে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি অথবা জান্নাতের অফুরন্ত সুখ ও শান্তি।

আজীবন মহাসত্যবাদী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর এসব ওহী নির্ভর বক্তব্য শুনে সে সমাজের ভাগ্যবান ব্যক্তিরা নিজেদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামী আদর্শের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছেন। জীবন পরিচালনা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে লোহা পুড়ে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছেন। এই ছিলো বিশ্বনবীর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পটভূমি। হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, খাব্বাব, খুব্বাইব, আম্মার, বিলাল (রাঃ)-এর মতো অসংখ্য পুতঃ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী সাহাবাদের একটি টীম তৈরী হলো। তাঁদের নিয়ে নবী করীম (সাঃ) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করলেন। প্রতিষ্ঠিত হলো জবাবদীহীমূলক সরকার। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান নীতির ভিত্তিতে সাদা-কালোর ব্যবধান দূরীভূত হলো। জাতি-ধর্ম, দলমত, নারী-শিশু, বৃদ্ধ সকলেই তাদের প্রাপ্য অধিকার বুঝে পেলো। রইলো না আর মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ, দুর্নীতি, আত্মসাৎ ও চৌর্যবৃত্তির শেষ ক্ষত চিহ্নটুকুও মুছে গেলো সমাজদেহ থেকে।

www.pathagar.com

ইতিহাস সাক্ষী, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দুর্নীতি মুক্ত সমাজ-রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। তাঁর ইন্তেকালের পর ক্ষমতায় এলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। তিনি মদীনা রাষ্ট্রে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-কে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ প্রদান করলেন। ঐতিহাসিকরা লিখছেন–

বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের এক বছর পূর্ণ হবার পর হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট এসে বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগের অনুমতি চাইতে গিয়ে বললেন, এ দেশে আদালত বা বিচারপতির কি প্রয়োজন? আমার দায়িত্ব পালনের আজ এক বছর পূর্ণ হলো। এই পুরো এক বছরে আমার কাছে কোনো দুই ব্যক্তি একজনের বিরুদ্ধে আরেকজন মামলা দায়ের করতে আসেনি। সুতরাং আমাকে পদত্যাগ পত্র জমাদানের অনুমতি দিন।

খলীফা প্রশ্ন করলেন, এর কারণ কি বলে মনে হয় আপনার কাছে? পুরো এক বছরে আপনার আদালতে একটি অভিযোগ পত্র বা একটি মামলাও কেনো দায়ের হলো না? জবাবে হযরত ওমর (রাঃ) যা বললেন তা নিম্নরূপ–

'হে খলীফা! আমার চিন্তায় আমি যেটা পেয়েছি তা হচ্ছে আপনি আমাকে এমন একটি জাতির বিচারপতি পদে নিয়োগ দিয়েছেন, যে জাতির দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হচ্ছে, পরস্পরের কল্যাণ কামনা করা, কারোও কোনো ক্ষতি হয়, অধিকার নষ্ট হয়, এমন কাজ এরা কেউ করে না। এমন কথাও এরা কেউ বলে না। আর তাদের সংবিধান হচ্ছে কোরআন। কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর দেয়া সকল আদেশ তারা মেনে চলে এবং কোরআনে বর্ণিত সকল নিষিদ্ধ কর্ম তারা তা বর্জন করে। তাদের রুটিন মাফিক কাজ হচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে ভালো কাজের আদেশ দেয়া বা উৎসাহিত করা, আর সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা। এ জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ও অন্যের অধিকারের সীমানা চেনে, তাই নিজের বা অন্যের অধিকারের সীমানা তারা কোনোক্রমেই অতিক্রম করেনা। এদের একজন অসুস্থ হলে অন্যেরা তার সেবায় এগিয়ে আসে। তাদের কেউ অভাবগ্রস্থ হলে অন্যেরা তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এমনকি সাময়িকভাবে কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে তার সাহায্যের জন্যেও এ সমাজে লোকের অভাব হয় না। অতএব এই যখন একটি দেশের অধিবাসীদের জাতিয় চরিত্র, তখন কোন্ দুঃখে কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে বিচারকের দুয়ারে আসবে?'

www.pathagar.com

পাঠক, এতক্ষণ যে বর্ণনা পড়লেন তা কোনো কল্প-কাহিনী নয়, এই ছিলো নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুফল- যা রাসূল (সাঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিবরণে জানতে পারলেন।

ব্যক্তিগতভাবে, দলগতভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে যখন লোকেরা আল্লাহ ও রাসূল নির্দেশিত আইনের প্রতি উদাসীন হয়, শয়তান তখন তাদেরকে অবৈধ ভোগ-বিলাসী জীবন-যাপনের প্রতি আকৃষ্ট করে। মানুষ তখন পরকালের জবাবদীহীতা ভুলে গিয়ে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও জনগণের সম্পদের ওপর লোলুপ জিহ্বা বিস্তার করে রাক্ষসের মতো যা পায় অবলীলাক্রমে তাই গিলতে থাকে– বনও খায় জঙ্গলও খায়।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্বে সর্বপ্রথম দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠনে সবথেকে সফল রাষ্ট্র প্রধান বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। তাঁর সফলতার মূল কারণ ছিলো তিনি মানুষকে ওহীর জ্ঞান দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি এবং পরকালে জবাবদীহীমূলক মানসিকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজও যদি সত্যিকার অর্থে আমরা দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র দেখতে চাই তাহলে সকল নাগরিকদের এবং প্রশাসনের প্রত্যেক স্তরে কর্মরত লোকদের জন্যে নৈতিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে– যেভাবে করেছিলেন নবী করীম (সাঃ)। এ জন্যে কোরআন মজীদে নিম্ন বর্ণিত মাত্র কয়েকটি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন, অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণ ও চরিত্র গঠনে এ আয়াতসমূহের প্রভাব কতো সুদূর প্রসারী।

➡ নিঃসন্দেহে আমি মানুষদের সৃষ্টি করেছি তার মনের কোণে যে খারাপ চিন্তা উদয় হয়– সে সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। আমি তার ঘাড়ের রগ থেকেও তার অনেক কাছে (অবস্থান করি)। (সূরা কাফ, আয়াত নং-১৬)

➡ মানুষ (ক্ষুদ্র) একটি শব্দও সে উচ্চারণ করে না যা সংরক্ষণ করার জন্য একজন সদাসতর্ক প্রহরী তার পাশে নিয়োজিত থাকে না। (সূরা কাফ, আয়াত নং-১৮)

➡ তোমাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করা আছে, এরা হচ্ছেন সম্মানীত লিখক (ফিরিশ্‌তা) তারা জানে তোমরা যা করছো। (সূরা ইনফিতর, আয়াত নং-১০-১২)

➡ তোমরা তোমাদের মনের মধ্যে যা কিছু আছে তা যদি প্রকাশ বা গোপন করো আল্লাহ তা'য়ালা (একদিন) তোমাদের কাছ থেকে তা (পুরোপুরি) হিসাব গ্রহণ

www.pathagar.com

করবেন, এরপর তিনি যাকে খুশী মাফ করবেন, যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (সূরা বাকারাহ্, আয়াত নং-২৮৪)

➡ প্রত্যেকের ভালো-মন্দ কর্মলিপি আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি, আমি তা কিয়ামতের দিন একটি কিতাব আকারে খুলে তার হাতে তুলে দিবো। তাকে বলা হবে তুমি নিজের কর্মলিপি (এখন) নিজেই পড়ে দেখো। তুমি নিজেই নিজের হিসাব করার জন্য যথেষ্ট। (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত নং-১৩, ১৪)

➡ আজ (কিয়ামতের দিন) আমি তোমাদের মুখের ওপর ছিপি এঁটে দিবো (তখন) তোমাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে, পা-গুলো (আমার কাছে) সাক্ষ্য দিবে এরা কি কাজ করে এসেছে। (সূরা ইয়াসীন, আয়াত নং-৬৫)

হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে ন'টি উপদেশ দিয়েছিলেন– যা কোরআন মজীদে আল্লাহ তা'য়ালা উদ্ধৃত করেছেন। তন্মধ্যে একটি উপদেশ ছিলো এ রকম–

➡ হে প্রিয় বৎস! যদি তোমার কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণ (ছোটও) হয় এবং তা যদি কোনো শিলাখন্ডের ভেতরে কিংবা আসমানসমূহেও (লুকিয়ে) থাকে অথবা (যদি তা থাকে) যমীনের ভেতরে তাও আল্লাহ তা'য়ালা (সামনে) এনে হাজির করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই সুক্ষ্মদর্শী এবং সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। (সূরা লূকমান, আয়াত নং-১৬)

➡ অতএব যে ব্যক্তি এক অনুপরিমাণ কোনো ভালো কাজ করে (সেদিন) তাও সে দেখতে পাবে। (ঠিক তেমনি) কোনো মানুষ যদি অনুপরিমাণ খারাপ কাজও করে সে তার (চোখের সামনে) তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, আয়াত নং-৭-৮)

➡ তুমি কি কখনো অনুধাবন করোনা যে আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা'য়ালা তা সবই জানেন। কখনো এমন হয় না যে তিন ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন শলা-পরামর্শ হয় (সেখানে) চতুর্থ হিসেবে আল্লাহ উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচজনের মধ্যে (কোনো গোপন পরামর্শ হয় যেখানে) ষষ্ঠ হিসেবে আল্লাহ থাকেন না। (এ শলা-পরামর্শকারীদের সংখ্যা) এর চাইতে কম হোক বা বেশী হোক তারা যেখানেই থাকনা কেনো আল্লাহ তা'য়ালা সব সময়ই তাদের সাথে আছেন। অতঃপর কিয়মাতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের (সবাইকে) বলে দিবেন তারা কি কি কাজ করে এসেছে। (সূরা মুজাদিলাহ্, আয়াত নং-৭)

www.pathagar.com

➡ যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের চাবি তাঁর হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে। সেই (অদৃশ্য) খবর তো তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না; জলে-স্থলে (যেখানে) যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন (এই সৃষ্টিরাজির মধ্যে) একটি পাতা কোথাও ঝরে না যার (খবর) তিনি জানেন না। (সূরা আনয়াম, আয়াত নং- ৫৯)

মানব জীবনকে পরিচ্ছন্ন ও দুর্নীতি মুক্ত করার লক্ষ্যে এভাবে পরকালে জবাবদীহীতা এবং মৃত্যু পরবর্তী পরকালীন জীবন সম্পর্কিত যত কথা আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন তা একত্রিত করলে গোটা কোরআন মজীদের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দশ পারার সমান হবে। নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র জবানীতে সাহাবায়ে কেরাম এসব তথ্য জানতে পেরেছেন এবং সেভাবে জীবন গড়েছেন। এ কারণেই নবীর পরেই সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থান। তাঁরাই ছিলেন বিশ্ব সভ্যতা নির্মাণের এবং দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠনের সর্বোত্তম মূল স্থপতি। সমগ্র বিশ্বে তাঁদের কোনো তুলনা নেই। সুতরাং দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য কোনো দেশের মানব রচিত সংবিধান অনুসরণের চিন্তা-চেতনা হবে চরম আত্মঘাতমূলক নির্বুদ্ধিতা।

আইন যতোই কঠোর থেকে কঠোরতর হোক, শাস্তি যতোই প্রলম্বিত ও লোমহর্ষক হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মনের গহীনে আল্লাহভীতি সৃষ্টি না হবে, পরকালে জবাবদীহীতার মানসিকতা সৃষ্টি না হবে ততদিন দুর্নীতি সমূলে নির্মূল করা আদৌ সম্ভব নয়। এখানে অপরাধমুক্ত সমাজ-রাষ্ট্রের স্বর্ণালী ইতিহাসের আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই।

নবী করীম (সাঃ)-এর শেষ যুগে মদীনা থেকে এক সুন্দরী যুবতী মেয়ে কোনো এক আত্মীয় বাড়িতে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছে। পথিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। নির্জন মরুভূমিতে একাকিনী যুবতী মেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত পদে দ্রুত তার গন্তব্য স্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তাঁর মনে শঙ্কা ছিলো যদি এই মুহূর্তে কোনো পর পুরুষের সম্মুখে আমি পড়ে যাই তাহলে আমার অলঙ্কারাদী তো ছিন্তাই হবেই সেই সাথে নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্বও লুণ্ঠিত হবে। হঠাৎ যুবতীর দৃষ্টি গোচর হলো, দূর থেকে এক সুদর্শন যুবক তার দিকেই এগিয়ে আসছে। যুবতী আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় হতবিহ্বল হয়ে বসে পড়লো। ইতোমধ্যে যুবকটি তাঁর সম্মুখে এসে যুবতীর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে ভয়বিহ্বলা চোখের ওপর চোখ রেখে বিনয়ের সাথে বললো, 'মা! তুমি ভয় পাচ্ছো কেনো! তুমি কোথায় যাবে

www.pathagar.com

আমাকে বলো মা, আমি নিরাপদে পাহারা দিয়ে তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দিবো। আমাকে দিয়ে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। আমার পরিচয় শোনো, আমি মুসলমান।' এই ছিলো নবী করীম (সাঃ)-এর রক্ত ও সাহাবায়ে কেরামের জীবন দিয়ে গড়া ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস।

ইতিহাসে বর্ণিত এই যুবক আইনের শাসনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বা কঠোর শাস্তির ভয়ে ঐ যুবতীর সাথে অনৈতিক আচরণ করা থেকে বিরত থাকেনি। কারণ সেখানে কোনো অঘটন ঘটলে তার সাক্ষীও কেউ থাকতো না এবং বিচারও হতো না। এ যুবকের হাতের মুঠোয় পাওয়া মহাপাপ থেকে যে শক্তি তাকে রক্ষা করলো তার নাম **'আল্লাহর ভয়'**। সুতরাং কেউ না দেখলেও আল্লাহর অতন্দ্র দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। এই মানসিকতা সৃষ্টির পূর্বে শতভাগ দুর্নীতি ও অপরাধ মুক্ত সমাজ আশা করা আকাশ কুসুম পরিকল্পনা বৈ আর কিছুই নয়।

হযরত আলী (রাঃ) কত সুন্দর কথাই না বলেছেন, **'যখন তুমি একাকীত্বে থাকবে তখন আল্লাহ তা'য়ালাকে আরো বেশী ভয় করবে। কারণ ঐ সময় তোমার কৃত অপরাধের যিনি সাক্ষী তিনিই হবেন কিয়ামতে তোমার বিচারক।'**

পৃথিবীর ইতিহাস এমন একটি ঘটনাও পেশ করতে পারবে না, যেখানে কোনো আল্লাহভীরু প্রকৃত অর্থে মুসলমান নিজের পক্ষ থেকে হিংসা, জিঘাংসা, রক্তপাত, মারামারি বা যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে। মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজিররা মদীনার আনসারদের সাথে গভীর মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, অথচ ঈমান ব্যতীত তাঁদের মধ্যে অন্য কোনো আত্মীয়তার যোগসূত্র ছিলো না। ইতিহাসে আদর্শের শক্তি ও প্রভাবের এটাই একক ও অসাধারণ দৃষ্টান্ত। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্র পরস্পরের প্রাণের দুশমন ছিলো। এক গোত্র অপর গোত্রের পরম আপনজনকে হত্যা করেছিলো। অঢেল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেও তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব ছিলো না এবং মমতার বাগডোরে তাদেরকে বাঁধা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু একমাত্র আল কোরআনই তাদের হৃদয় থেকে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও হিংসা দূর করে দিয়ে গভীর মমতার বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলো। মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারদের মধ্যে এবং পরস্পরের প্রতি চরম বৈরীভাবাপন্ন মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে শুধুমাত্র কোরআনের কারণে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক এমনই

www.pathagar.com

শক্তিশালী সম্পর্কের রূপ নিয়েছিলো, যার সামনে রক্তের সম্পর্কও নিষ্প্রভ এবং পৃথিবীর যাবতীয় বন্ধুত্বই ম্লান ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিলো। পৃথিবীর জাতিসমূহের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান চালালেও এই ধরনের নিঃস্বার্থ প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

একমাত্র আল্লাহর ভয়ই তাঁদেরকে আল্লাহর রাসূলের সামনে তাঁদের গোপন ভুল-ভ্রান্তির কথা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য করতো এবং হঠাৎ ঘটে যাওয়া প্রাণদন্ড তুল্য সংঘটিত অপরাধের শাস্তি গ্রহণের জন্য নিজেকে পেশ করতে বাধ্য করতো।

নিজের অজান্তে কোনো সময় শয়তানের কুমন্ত্রণায় তাঁদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হয়েছে আর এর সুযোগ তখন ঘটেছে যখন কোনো মানব চক্ষু তা অবলোকন করেনি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে আইনের ধারা-উপধারা গ্রেফতার করতে অক্ষম হয়েছে, এ অবস্থায় আল্লাহর ভয়ই তখন তীব্র ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করেছে। আল্লাহর ভয়ের রশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পা এমনভাবে বেঁধেছে যে, সে ব্যক্তি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

আল্লাহর ভয় তাঁর মন-মস্তিষ্কে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর ভেতরে গোনাহর স্মরণ ও পরকালের শাস্তির বিষয়টি এমন পীড়াদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, তাঁর জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি বিদায় গ্রহণ করেছে। শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য হয়ে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে গোপনে সংঘটিত অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে কঠিন দন্ড ভোগের জন্য নিজেকে পেশ করেছে। এরপর নির্ধারিত চরম দন্ড সে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে এবং হাসি মুখে দন্ড ভোগ করেছে যেন মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তির মোকাবেলায় পৃথিবীতেই শাস্তি ভোগ করে হাশরের ময়দানে অপরাধ মুক্ত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে পারে। আল্লাহর ভয়ই ছিলো তাঁদের আমানত, সততা, নৈতিকতা, সচ্চরিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রহরীস্বরূপ।

প্রকাশ্যে-গোপনে, নীরবে-নির্জনে ও জনসমাবেশে আল্লাহর ভয়ই ছিলো অতন্দ্র প্রহরী। যেখানে দেখার মতো কেউ থাকতো না, এমন নীরব নির্জন স্থান, যেখানে একজন মানুষের পক্ষে যা খুশী তাই করার পূর্ণ সুযোগ থাকতো, যেখানে কেউ

www.pathagar.com

দেখে ফেলবে–এই ভয় ছিলো না–সেখানেও একমাত্র আল্লাহর ভয়ই তাঁদের নফস তথা প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামের বিজয়ের ইতিহাসে সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও নিষ্ঠার এমন সব ঘটনা বিদ্যমান যে, মানবেতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র আল্লাহ ও পরকাল ভীতির কারণেই এসব কিছু সম্ভব হয়েছিলো।

ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম বাহিনী পারস্যের তদানীন্তন রাজধানী মাদায়েনে যখন উপস্থিত হয়েছিলো, তখন সাধারণ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পারস্য সম্রাটের ধন-রত্ন সংগ্রহ করে একজন হিসাব রক্ষকের কাজে জমা দেয়া হচ্ছিলো। একজন মুসলিম সৈন্য সবথেকে মূল্যবান ধন-রত্নের স্তুপ এনে যখন হিসাব রক্ষকের কাছে জমা দিলো তখন উপস্থিত লোকজন তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, **'এই লোক যে মূল্যবান ধন-রত্ন এনেছে তা আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের সকলের সংগ্রহ করা সম্পদের তুলনায় এই লোকের একার সংগ্রহ করা সম্পদ অধিক মূল্যবান।'** এরপর একজন লোক সেই লোককে প্রশ্ন করলো, **'ভাই, তুমি এসব মূল্যবান ধন-রত্ন থেকে কোনো কিছু নিজের জন্য কোথাও সরিয়ে রেখে আসনি তো?'**

লোকটি মহান আল্লাহ তা'য়ালার নামে শপথ করে বললো, **'বিষয়টি যদি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পৃক্ত না হতো তাহলে এসব মূল্যবান ধন-রত্ন সম্পর্কে তোমরা কোনো সংবাদই জানতে পারতে না। সবটাই আমি সরিয়ে ফেলতাম।'**

লোকজন স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারলো, এই লোক যা বলছে তার একটি শব্দও অসত্য নয়। তাঁর নাম-পরিচয় জানতে চাওয়া হলে সে জানালো, **'আমি আমার নাম ও বংশ পরিচয় প্রকাশ করলে তোমরা আমার প্রশংসা করবে–অথচ প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি যদি আমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে কোনো বিনিময় দিতে চান, তাহলে আমি তাতেই সন্তুষ্ট।'** কথা শেষ করে লোকটি যখন চলে গেলো, তখন গোয়েন্দাদের মাধ্যমে লোকটির পরিচয় জানা গেলো যে, লোকটি ছিলো আবদে কায়স গোত্রের লোক এবং তাঁর নাম ছিলো আমের। (তারীখে তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬)

www.pathagar.com

আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার পরে তাঁরা মহান আল্লাহর গোলামীর এক সুনির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেছিলেন যে, তাঁদের জন্য ঈমান যে বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো, সেই বৃত্তের বাইরে আসা কল্পনারও অতীত হয়ে পড়েছিলো।

তাঁরা মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর ক্ষমতা মাথা পেতে নিয়েছিলেন এবং অনুগত প্রজা, ভৃত্য ও গোলাম হিসাবে জীবন পরিচালিত করতেন। তাঁরা পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহর সমীপে নিজেদের আমিত্ব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহর বিধানের সামনে নিঃশর্তে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছিলেন এবং নিজেদের কামনা-বাসনাকে ঈমানের রঙে রঙিন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা এমনভাবে ঈমান এনেছিলেন যে, নিজেদেরকে নিজেদের অর্থ-সম্পদ, শক্তি-মত্তা, বীরত্ব, নেতৃত্ব, জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও যোগ্যতার মালিক মনে করতেন না এবং এগুলো নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহারও করতেন না। তাঁদের প্রেম-ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, আত্মীয়তা, অনুরাগ-বিরাগ, লেন-দেন, কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ছিন্নকরণ সকল কিছুই মহান আল্লাহর ভয়ের অধীন করে দিয়েছিলেন।

তাঁদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন ঈমানের দাবি অনুসারে স্পন্দিত হতো। তাঁরা নিশ্বাস গ্রহণ করতেন ঈমানের দাবি অনুসারে এবং তা ছাড়তেনও ঈমান নির্দেশিত পন্থায়। ঈমানের বিপরীত জীবনধারা সম্পর্কে তাঁরা খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, কারণ তাঁরা জাহিলিয়াতের ছায়াতলেই বর্ধিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা ঈমানের মর্ম সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, ঈমান আনার অর্থই হলো, এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়া। একদিকে মানুষের প্রভুত্ব ও অন্য দিকে মহান আল্লাহর গোলামী। তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন, ঈমান আনার অর্থই হলো, আমিত্বের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর গোলামীকে কবুল করতে হবে। **'আমি যখনই ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখনই আমার আমিত্ব বা মতামত বলতে অবশিষ্ট কিছু নেই। স্বেচ্ছাচারিতামূলক কোনো কাজ আর করা যাবে না। ঈমান আনার পরে আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলতে আর কিছুই নেই'।**

www.pathagar.com

ঈমান আনার পরে রাসূলের সিদ্ধান্তের মোকাবেলায় কোনো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা যাবে না। ঈমানের বিপরীত বিধানের সামনে কোনো মামলা-মোকদ্দমা পেশ করা যাবে না বা নিজের ইচ্ছানুসারে কোনো সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় সমাজ ও দেশে প্রচলিত কোনো প্রথার অনুসরণ করা যাবে না। ঈমান আনার পরে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না বা আত্মপূজায় নিমগ্ন থাকা যাবে না। এসব দিক তাঁরা ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলেই যখনই তাঁরা ঈমান এনেছিলেন, তখনই জাহিলিয়াতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, নীতি-পদ্ধতি ও অভ্যাস পরিত্যাগ করে ইসলামকে তার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় বিষয়াদিসহ গ্রহণ করেছিলেন–ফলে তাঁদের জীবনে এক পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো। হযরত ফুযালা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করার পরে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। ইতোপূর্বে তাঁর সাথে এক মহিলার সম্পর্ক ছিলো। পথে সেই মহিলার সাথে দেখা হলে মহিলা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার আগ্রহ প্রকাশ করলো। হযরত ফুযালা (রাঃ) সেই মহিলাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, **'এখন আর সেই সুযোগ নেই, আমি ঈমান এনেছি–আমি আল্লাহর গোলাম, এখন আর তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার কোনো অবকাশ নেই।'** (যাদুল মা'আদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৩২)

আল্লাহ ও পরকাল ভীতি তাঁদের মধ্যে মানবতার সকল শাখা-প্রশাখা ও সৌন্দর্যের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ও দৃশ্যমান করেছিলো। তাঁরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকতেন এবং যেখানেই যেতেন, সেখানে নীতি-নৈতিকতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। তাঁরা শাসক হিসাবেই থাকুন অথবা রাষ্ট্রের একজন কর্মচারী হিসাবে, তাঁদের সর্বদাই সংযত, শুচি-শুভ্র, চরিত্রবান, আমানতদার, বিনয়ী, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি হিসাবেই দেখতে পাওয়া যেতো। প্রতিপক্ষ তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করতো, **'রাতে তাঁদেরকে দেখতে পাবে যেন পৃথিবীর সাথে তাঁদের কোনো সম্পর্কই নেই এবং ইবাদাত-বন্দেগী ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো কাজই নেই। আর দিনের বেলা দেখতে পাবে, রোযাদার হিসাবে ও প্রতিজ্ঞা পালনকারী হিসাবে। তাঁরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। নিজেদের বিজিত এলাকায়ও তাঁরা মূল্য প্রদান করে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে খায়। কোথাও প্রবেশ করতে হলে সর্বাগ্রে সালাম প্রদান করে এবং যুদ্ধের ময়দানে এমন দৃঢ় ও সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে যে,**

www.pathagar.com

শত্রুকে পরাজিত করেই যুদ্ধে বিরতি দেয়। নিজেদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার করে আর সাম্যের পরিচয় দেয়। দিনের বেলা তাঁরা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন এবং মনে হবে যে, শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করাই যেন তাঁদের একমাত্র কাজ।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৩)

আল্লাহর ভয়ই এভাবেই তাঁদের গোটা জীবনে পরিপূর্ণ এক বিস্ময়কর বিপ্লব সাধন করেছিলো। আল্লাহর ও পরকাল ভীতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সেই কল্যাণ ও মঙ্গলের সৌরভে সুবাসিত মানব সমাজ ও রাষ্ট্র, যে সমাজ ও রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে নবী করীম (সাঃ) মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। আজও পৃথিবীর মানুষ যাবতীয় দুর্নীতি শোষণ-লুন্ঠন, নির্যাতন-নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষন থেকে মুক্তি লাভ করে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী, নিরাপত্তাপূর্ণ, শোষণমুক্ত-ভীতিহীন সমাজ ও রাষ্ট্র লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি আল্লাহর ও পরকাল ভীতিকে নিজেদের চারিত্রিক ভূষণে পরিণত করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ ও রাসূলকে বাদ দিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আমাদের দেশের সেনাবাহিনীই নয়– সমগ্র দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশের সকল বাহিনী একত্রিত হয়ে অভিযান পরিচালিত করলেও দুর্নীতি ও অপরাধ মুক্ত সেই সমাজ-রাষ্ট্র পাওয়া সম্ভব নয়, যে স্বর্ণালী সমাজ-রাষ্ট্র নবী করীম (সাঃ) শুধু মাত্র আল্লাহ ও পরকাল ভীতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বলাবাহুল্য, দুর্নীতি ও অপরাধ মুক্ত সমাজ গঠনের সেটাই একমাত্র সর্বোত্তম মূলনীতি, যে মূলনীতি নবী করীম (সাঃ) বাস্তবায়ন করেছিলেন।

যে কোনো ব্যধির মূল উৎস খুঁজে বের করতে না পারলে এলো-পাথাড়ি চিকিৎসায় রোগ নির্মূল না করে নতুন জটিলতাই সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যধির মূল কারণ নৈতিকতার ধ্বস। পরকালে জবাবদীহীতার প্রতি উদাসীনতা, আল্লাহ ও রাসূলের বিধান সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা ও মূর্খতা। এ মহাসঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকল পর্যায়ের প্রতিটি দায়িত্বশীল তার নিজস্ব পরিমন্ডলে নিজে ভালো হবার ও অন্যকে ভালো বানাবার চেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে। সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে নিজে বাঁচতে হবে অন্যকেও দুর্নীতি থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা নিরন্তর চালাতে হবে। এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় আনতে হবে আমূল পরিবর্তন, যাতে করে শিশু তার প্রাথমিক শিক্ষা

www.pathagar.com

থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে কোরআন-হাদীসের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নৈতিক মূলবোধের সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে অমুসলিম শিক্ষার্থীদের বেলায় তাদের ধর্ম শিক্ষাও বাধ্যতামূলক করা উচিত। কারণ ধর্মীয় মূল্যবোধ ছাড়া মানুষের চরিত্র ভালো করার অন্য কোনো পথ খোলা নেই। অন্যথায় নিম্ন বর্ণিত হাদীসের সতর্ক বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন–

হযরত হোযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, **'তোমরা পরস্পরকে অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ করবেই এবং অন্যায় কাজের নিষেধ বা প্রতিরোধ করবেই। যদি তোমরা এ দায়িত্ব পালন না করো তাহলে তোমাদের মধ্যের সব থেকে দুষ্ট (কঠোর প্রকৃতির) লোকদের তোমাদের শাসক বানিয়ে দেয়া হবে। তখন তোমাদের নেককার লোকেরা এ অবস্থা থেকে নিস্তার লাভের জন্য যত দোয়াই করুক, আল্লাহর দরবারে তা মঞ্জুর হবে না।'** (তিরমিযী)

পরিশেষে আমাদের বর্তমান বিপর্যয়ের কারণ সমূহের মধ্যে এখানে আমি মৌলিক তিনটি কারণ উল্লেখ করতে চাই ঃ–

একঃ মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে বিচ্যুতিঃ যে কোরআন মুসলমানদের শক্তির উৎস, যে কোরআন মুসলমানদেরকে দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে ছিলো, বিগত দুই হাজার বছরের প্রায় ১২শ বছর ধরে পরিচিত বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশী এলাকা শাসন করিয়েছিলো, সেই কোরআনের সাথে তাদের সম্পর্ক শুধু সওয়াবের নিয়তে না বুঝে তিলাওয়াত করা ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই।

কোরআনের আলোকে জীবন গঠন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনীতিসহ জীবনের বিশাল অঙ্গন থেকে কোরআনকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে।

দুইঃ রাসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বের প্রতি দুর্ভাগ্যজনক বিমুখতাঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

➡ তোমাদের রাসূল তোমাদের জন্য যা কিছু আনয়ন করেছেন তা গ্রহণ করো আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর, আয়াত নং- ৭)

www.pathagar.com

আল কোরআন থেকে মুখ ফেরানো এবং তাঁর প্রিয় রাসূলকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে অনীহা– যা মুসলিম উম্মাহকে গোমরাহ করে অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে।

তিনঃ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার প্রতি অনীহাঃ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের সকলকেই তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদীহী করতে হবে।' (বোখারী)

এ হাদীস অনুযায়ী দেশের রাষ্ট্র প্রধান- সরকার প্রধান থেকে শুরু করে গৃহকর্তা পর্যন্ত সকলকেই কিয়ামতের কঠিন বিচার দিবসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালকদের দায়-দায়িত্ব সর্বাধিক। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালাকে বেশী ভয় করা প্রয়োজন। ক্ষমতা আছে বলেই জনগণকে নিজের ইচ্ছে মতো পরিচালনার এখতিয়ার কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালার অমোঘ বিধানে গতকাল পর্যন্ত যিনি প্রভাবশালী প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী ছিলেন আজ তিনি কয়েদখানার আসামী; এসব দৃষ্টান্ত চোখে দেখার পরও যেসব রঙ্গীন চশমাধারী ক্ষমতা লোভীদের শিক্ষা হয়না, এসব জাত পাগলদের হিদায়াত কি করে হবে?

ইসলামী বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অথচ এ ক্ষেত্রেও রয়েছে মুসলিম নামধারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চরম বিতর্ক এবং এসব ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন তাঁরা, যেসব ব্যক্তিবর্গ সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও এনজিওর মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী মিডিয়াগুলোরও নিয়ন্ত্রণকারী।

দেশ ও জাতির এ নৈতিক অবক্ষয়ের ক্রান্তিলগ্নে ক্ষমতাসীনদের উচিৎ দেশের রাজধানী থেকে শুরু করে সকল জেলা-উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যন্ত সকল উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোয় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভার আয়োজন করে জনগণকে কোরআন-হাদীসের দৃষ্টি ভঙ্গিতে নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আর প্রচার মাধ্যমকেও এ কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।

লক্ষ্যণীয়, যে কোনো মুসলিম দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মহিলারা এখনো পর্দা কম করেন না, বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি কিশোর, তরুণ-যুবকদের আদব-কায়দা, ভক্তি-শ্রদ্ধা একেবারে কমে যায়নি। জুমুআ'র দিন মসজিদসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

স্থান সঙ্কুলান হয় না। মানুষের মৌলিক মানবিক গুণাবলী এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। নৈতিক অবক্ষয়ের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে এখনো উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সমাজে অবশিষ্ট থাকার মূল কারণ হলো, দেশের তিন লক্ষাধিক মসজিদের ইমামদের প্রতি জুমুআ'য় প্রদত্ত শিক্ষণীয় বক্তব্য। মাদ্রসাসমূহে মৌলিক দ্বীনি শিক্ষা, দেশব্যাপী ওলামা-মাশায়েখদের ওয়াজ মাহফিল, তাফসীর মাহফিল, সীরাত মাহফিল ও সর্বোপরি দ্বীনি সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নৈতিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। কোনো দুষ্ট চক্রের কুপরামর্শে এসব দ্বীনি কর্মতৎপরতা বন্ধ করে দেয়ার চাতুর্য্য অবলম্বন করা হলে তা হবে দেশ ও জাতির জন্য সুদূর প্রসারী আত্মঘাতী।

আমাদের দেশ একেবারেই হত-দরিদ্র দেশ নয়। আমাদের রয়েছে আবাদযোগ্য বিশাল কৃষি ভূমি, গবাদী সম্পদ, বনজ সম্পদ, গ্যাস সম্পদ, পানি সম্পদ, মৎস সম্পদ, খনিজ সম্পদ সর্বোপরি ১৪কোটি মানব সম্পদের ২৮ কোটি কর্মক্ষম হাত। অভাব যা তা শুধু সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের। এ অভাব পূরণ করতে পারলে আমাদের দেশ হতে পারতো মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডের মতো।

ওষুধ যতোই খাঁটি হোক– সেবন না করলে রোগ নিরাময়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। অনুরূপভাবে নসীহত যতোই বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত এবং মণি-মুক্তা সদৃশ মূল্যবান হোক, তা আমল না করলে কোনো লাভ নেই। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে মহাসত্য অনুধাবন করে তা অনুসরণের তাওফীক দিন– আমীন।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব কর্তৃক লিখিত এ নিবন্ধটি দৈনিক নয়া দিগন্ত, দৈনিক সংগ্রাম ও সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে **'দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার মূলনীতি'** শিরোণামে প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

দেশী পণ্য দেশের মানুষের জন্য

শাড়ী, লুঙ্গী, বেডশীট এবং থ্রী পিছ
এর জন্য

আপনিও পারেন জেক্স টেক্সটাইলের একটি শো-রুমের মালিক হতে।

Quality
You can trust . . .

Jex Textile

www.jextextile.com

Akber Bhaban (ground floor), 2, Syed Hasan Ali Lane, Islampur, Dhaka-1100. Ph : 7393855.